

বাংলা রূপকথার ভাষাছাঁদ ও শিশু-মনস্তত্ত্ব

দেবারতি জানা

সারসংক্ষেপ :

বাংলা ভাষায় যখন শিশুর জন্য শিশুসাহিত্যের পৃথক সত্তার অমিল তখন প্রাচীন লোকজ রূপকথার দুনিয়ায় শিশুদের জন্য আদৌ কোনো সম্পদ লুক্কায়িত আছে কিনা, রূপকথাগুলির ভাষা-নির্ভর আয়োজন শিশুদের কতদূর মনের সঙ্গী হয়ে ওঠার দাবিদার বর্তমান আলোচনাপত্রে সেই অন্বেষণ করা হয়েছে। উৎস হিসেবে নেওয়া হয়েছে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের সংকলিত ‘ঠাকুরমার ঝুলি’।

চারি শব্দ : শিশু, শিশু-মনস্তত্ত্ব, বাংলা রূপকথা, বাংলা ভাষা

১

‘এত বড় স্বদেশী জিনিস আমাদের দেশে আর কি আছে? এখনকার কালে বিলাতের ‘Fairy Tales’ আমাদের ছেলেদের একমাত্র গতি হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। স্বদেশের দিদিমা কোম্পানী একেবারে দেউলে। ইহাতে বয়স্ক লোকদের মন কঠিন স্বার্থপর এবং বিকৃত হইবার উপক্রম হইতেছে। দেশের শিশুরাও কোন পাপে আনন্দের রস হইতে বঞ্চিত হইল। তাহাদের পড়াঘরে টেবিলের ধারে কেবল বিলাতী বানান-বহির বিভীষিকা। মাতৃদুগ্ধ একেবারে ছাড়াইয়া লইয়া কেবলি ছোলার ছাতু খাওয়াইয়া মানুষ করিলে ছেলে কি বাঁচে! ইহার উৎস সমস্ত বাংলা দেশের মাতৃস্নেহের মধ্যে। যে স্নেহ দেশের রাজেশ্বর রাজা হইতে দীনতম কৃষককে পর্যন্ত বুকু করিয়া মানুষ করিয়াছে। নিখিল বঙ্গদেশের সেই চির পুরাতন গভীরতম স্নেহ হইতে এই রূপকথা উৎসারিত। বাঙ্গালীর ছেলে যখন রূপকথা শোনে তখন কেবল যে গল্প শুনিয়া সুখী হয়, তাহা নহে—সমস্ত বাংলা দেশের চিরন্তন স্নেহের সুরটি তাহার তরুণ চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে যেন বাংলার রসে রসাইয়া লয়। রূপকথার সেই বিশেষ ভাষা, বিশেষ রীতি, তাহার সেই প্রাচীন সরলতাটুকু’ দক্ষিণারঞ্জন ‘রক্ষা করিতে পারিয়াছেন।’^১

উদ্ধৃত বয়ান থেকে আলোচ্য রূপকথার গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব। বাংলা রূপকথাগুলি আমাদের অন্যতম শিশুসাহিত্য সত্তার। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার রূপকথাগুলি সংগ্রহ করে যেভাবে সংকলিত করেছেন সেখানে সংকলকের অংশগ্রহণ থাকলেও তিনি চেষ্টা করেছেন রচনাগুলির স্বকীয়তা যথাসম্ভব রক্ষা করতে। তাই পরম্পরাসূত্রে কথক থেকে ছোট্ট শ্রোতার কাছে রূপকথা যখন বাহিত হয় তখন শিশুমনে যে জগৎ তৈরি হয় তার প্রভাব দীর্ঘদিন থেকে যায় রচনাগুলির সারল্য ও শিল্পগুণে। ‘কথা’গুলির ভাষাবয়নে ঘনীভূত আছে সেই রহস্য যার হাত ধরে শিশুরা পাড়ি দেয় অজানিতের সন্ধানে। আজ সাইবার দুনিয়ায় রূপকথা শোনার মাধ্যম বদলেছে, এমনকি মায়ের মুখে গল্প শোনার ঐতিহ্যও লেগেছে দিনবদলের হাওয়া। লোকজ রূপকথা আজও শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশে কতদূর সহায়ক তা অন্বেষণ জরুরি। সেইসূত্রে রূপকথার ভাষাছাঁদ কীভাবে শিশু-উপযোগী আখ্যান ও সংলাপ নির্মাণ করে এবং কোন বার্তাই বা শিশুর কাছে হাজির করে তার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নই বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য।

শুরুতে আমাদের স্পষ্ট করে নেওয়া প্রয়োজন, ‘শিশু’ কারা ও ‘শিশুসাহিত্য’ই বা কেমন হওয়া বাঞ্ছনীয়। মোটামুটি ৩ বৎসর থেকে ৫ বৎসর বয়সীরা আদি শৈশবাবস্থায় (early childhood), ৫ থেকে ৮ বৎসর মধ্য শৈশব (middle childhood) এবং ৮ বৎসর থেকে ১২ বৎসরের বাচ্চারা অন্ত্য শৈশবাবস্থায় (late childhood) আছে বলে ধরা হয়। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে শিশুসাহিত্য বলে পৃথক অস্তিত্ব না থাকায় এবং সাধারণত ৫ বছর থেকে ১২ বা বিস্তৃত আকারে ১৬ বছর বয়সীদের শিশু ও কিশোরদের এক বন্ধনীকৃত করায় ৫ বছর থেকে ১৬ বছর বয়সীদের জন্য রচিত সাহিত্যই ‘শিশু ও কিশোর সাহিত্যের’ পর্যায়েভুক্ত। সাহিত্যে শিশু ও কিশোর এক করে ফেলার প্রবণতাহেতু পৃথকভাবে ‘শিশুসাহিত্য’ বাংলা ভাষায় অনুপস্থিত। তাছাড়া শিশু বা কিশোরদের ‘মনস্তত্ত্ব’ নিয়ে ভাবিত নন সাহিত্যিকেরা, বিশেষত বঙ্গদেশে। এই অবস্থায় প্রাচীন লোককথার ছায়ায় লালিত হওয়া রূপকথায় শিশুদের জন্য আদৌ কোনো ভাবনার অবকাশ ছিল কিনা এবং রূপকথার পাঠ ৫ থেকে ১০/১২ বছরের শ্রোতা এবং পাঠকের কাছে গ্রহণীয় এমন বিবেচনা করেই এই বিশ্লেষণ করা হল।

২

রূপকথা কী দিয়েছে তার শ্রোতাদের? আমাদের উদ্দিষ্ট শ্রোতাদের কথা ভাবলে প্রথমত আছে ‘বৈপরীত্যের পাঠ’। বিপরীতার্থক শব্দ, পদগুচ্ছ বা বাক্য প্রয়োগে দুটি পরস্পর-বিরোধী স্বভাব, পরিস্থিতি বা ঘটনার সঙ্গে শ্রোতার পরিচয় ঘটবে সহজেই।

- ‘পাঁচ রাণীর পাঁচ ছেলে হইল। এক-এক ছেলে যেন সোনার চাঁদ!’
- ‘ন-রাণী আর ছোটরাণীর কি হইল?’
- ‘ন-রাণীর পেটে এক পেঁচা আর
- ছোটরাণীর পেটে এক বানর হইল।’ (মানব বনাম মানবেতর প্রাণি)
- ‘বড় রাণীদের ঘরের সামনে ঢোল-ডগর বাজিয়া উঠিল।
- ‘ন-রাণী আর ছোটরাণীর ঘরে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল।’ (আনন্দ বনাম দুঃখ)
- ‘রাজা আর রাজ্যের সকলে আসিয়া পাঁচ রাণীকে জয়ডঙ্কা দিয়া ঘরে তুলিলেন।’
- ‘ন-রাণী, ছোটরাণীকে কেহ জিজ্ঞাসাও করিল না।’ (উৎসাহ বনাম অবজ্ঞা)

কিছুদিন পর

- ‘ন-রাণী চিড়িয়াখানার বাঁদী আর
- ছোটরাণী ঘুঁটেকুড়ানী দাসী হইয়া দুঃখে কষ্টে দিন কাটাইতে লাগিলেন।’ (রাণী বনাম দাসী, মর্যাদার বৈপরীত্য)
- ‘পেঁচার নাম হইল ভূতুম আর বানরের নাম হইল বুদ্ধ।’

তাদের কর্মকাণ্ড কেমন...

- ‘পাঁচ রাজপুত্র পাঁচটি পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ায়। তাঁহাদের সঙ্গে-সঙ্গে কত সিপাই লঙ্কর পাহারা থাকে।’
- ‘ভূতুম আর বুদ্ধ দুইজনে তাহাদের মায়েদের কুঁড়েঘরের পাশে একটা ছোট বকুলগাছের ডালে বসিয়া খেলা করে।’ (সুযোগ-সুবিধার তারতম্য)

আর স্বভাব

- ‘পাঁচ রাজপুত্রেরা বেড়াইতে বাহির হইয়া আজ ইহাকে মারে, কাল উহাকে মারে, আজ ইহার গর্দান নেয়, কাল উহার গর্দান নেয়; রাজ্যের লোক তিত-বিরক্ত হইয়া উঠিল।’

- ‘ভূতুম আর বুদ্ধ, দুইজনে খেলাধুলা করিয়া, যা’র-যা’র মায়ের সঙ্গে যায়। বুদ্ধ মায়ের ঘুঁটে কুড়াইয়া দেয়, ভূতুম চিড়িয়াখানার পাখীর ছানাগুলিকে আহার খাওয়াইয়া দেয়। আর দুই-একদিন পরপর দুইজনে রাজবাড়ীর দক্ষিণ দিকে বনের মধ্যে বেড়াইতে যায়।’ (মানবিক গুণের তারতম্য)

তাদের দিনযাপনেও ছাপ পড়েছে সেই বৈপরীত্যের

- ভূতুমের মা চিড়িয়াখানার বাঁদী, বুদ্ধের মা ঘুঁটে-কুড়ানী দাসী। কোনদিন খাইতে পায়, কোনদিন পায় না।
- ‘বুদ্ধ দুই মায়ের জন্য বন-জঙ্গল হইতে কত রকমের ফল আনে। ভূতুম ঠোঁটে করিয়া দুই মায়ের পান খাইবার সুপারী আনে।’ (রাজপুত্রদের সুখ বনাম বুদ্ধ-ভূতুমের দুঃখ)

যখন রাজপুত্র এবং মানবেতর প্রাণিরা জলযাত্রা করে তাদের আয়োজনের মধ্যেও উঠে আসে বিপরীত সংস্কৃতির ছোঁয়া

- ‘পাঁচ নিশান উড়াইয়া পাঁচখানা ময়ূরপঙ্খী আসিয়া ঘাটে লাগিল। রাজপুত্রেরা তাহাতে উঠিলেন।’
- ‘রাণীরা হলুধ্বনি দিয়া পাঁচ রাজপুত্রকে কলাবতী রাজকন্যার দেশে পাঠাইলেন।’
- ‘দুইখানা সুপারীর ডোঙ্গায়, দুইকড়া কড়ি, ধান দুর্বা আর আগা-গলুইয়ে পাছা-গলুইয়ে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে’ ভাসানো নায়ে ‘বুদ্ধ আর ভূতুম উঠিয়া বসিল।’
- মায়ের মনস্তাপ ও প্রার্থনা, ‘আমার বাছা থাকলে যেতিস মায়ের এই নায়। / পৃথিবীর যেখানে যে আছ ভগবান, / আমার বাছার তরে দিলাম এই দুর্বা ধান।’ (সংস্কৃতির প্রভেদ)

অবশেষে...

- ‘রাজা পাঁচ রাণীর আর পাঁচ রাজপুত্রের ঘরের উপরে কাঁটা দিয়া, মাটি দিয়া, বুজাইয়া দিলেন।’ (কলাবতী রাজকন্যা)
- ‘ন-রাণী, ছোটরাণী, বুধকুমার, রূপকুমার আর কলাবতী রাজকন্যা, হীরাবতী রাজকন্যা লইয়া রাজা সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন।’ (এ) (পরিণতির পার্থক্য)

এই আখ্যান থেকে শ্রোতার প্রাপ্তি যেমন—আনন্দ। মনস্কামনার তৃপ্তি। তেমনি শিক্ষণীয় বিষয়, ভালো-মন্দের বোধ। ইতিবাচকতা ও নেতির বৈশিষ্ট্য। মনোবৃত্তির সাদা-কালো দিক। যেখান থেকে জীবনবোধ গড়ে ওঠে, সতের জয় অসতের পরাজয়ের শিক্ষাও হয়।

দ্বিতীয়ত, মন্দ কাজের জন্য শাস্তিলাভের পাঠ...

- ‘নিষ্ঠুর বড়রাণীরা চুপি-চুপি হাঁড়ি-সরা আনিয়া ছেলেমেয়েগুলোকে তাহাতে পুরিয়া, পাঁশ-গাদায় পুঁতিয়া ফেলিয়া আসিল। কতগুলি ব্যাঙের ছানা, ইঁদুরের ছানা আনিয়া রাজাকে দেখাইল। রাজা আগুন হইয়া, ছোটরাণীকে রাজপুরীর বাহির করিয়া দিলেন।’ (সাত ভাই চম্পা)
- ‘ফুলের মধ্য হইতে সুন্দর সুন্দর চাঁদের মত সাত রাজপুত্র এক রাজকন্যা “মা মা” বলিয়া ডাকিয়া, বুপবুপ করিয়া ঘুঁটে-কুড়ানী দাসী ছোটরাণীর কোলে-কাঁখে বাঁপাইয়া পড়িল। রাজা তখনি বড়রাণীদিগে হেঁটে কাঁটা উপরে কাঁটা দিয়া পুঁতিয়া ফেলিতে আঞ্জা দিয়া, সাত রাজপুত্র, পারুল মেয়ে আর ছোটরাণীকে লইয়া রাজপুরীতে গেলেন।’ (এ)

এভাবেই তৈরি হয় জীবনে দুষ্টির দমন শিষ্টের পালনের বোধ।

তৃতীয়ত, বন্ধুত্বের অমর্যাদা, দুর্দিনে বন্ধুত্ব স্বীকার করার পাঠ...

- দুয়ারী রাখালকে ‘দূর দূর করিয়া খেদাইয়া দিল। মনের কষ্টে রাখাল কোথায় গেল, কেহই জানিল না। রাজার মুখ-ময় সূঁচ, গা-ময় সূঁচ, —মাথার চুল পর্যন্ত সূঁচ হইয়া গিয়াছে।’ (কাঁকনমালা, কাঞ্চনমালা)

- ‘রাজার গায়ের লাখ সূঁচ উঠিয়া গেল, রাজা চক্ষু চাহিয়া দেখেন, —রাখাল বন্ধু! রাজা বলিলেন, —“বন্ধু, আমার দোষ নিও না, শত জন্ম তপস্যা করিয়াও তোমার মত বন্ধু পাইব না। আজ হইতে তুমি আমার মন্ত্রী। তোমাকে ছাড়িয়া আমি কত কষ্ট পাইলাম; —আর ছাড়িব না।”
- ‘রাখাল, সারাদিন মন্ত্রীর কাজ করেন, রাত্রে চাঁদের আলোতে আকাশ ভরিয়া গেলে, রাজাকে লইয়া গিয়া নদীর ধারে সেই গাছের তলায় বসিয়া সোনার বাঁশি বাজান। রাজা গলাগলি করিয়া মন্ত্রী-বন্ধুর বাঁশি শোনেন।’

উপকারীর উপকার স্বীকার না করা অকৃতজ্ঞতা। সেই দোষে দোষী হলে তার পরিণতি কী হতে পারে সেই শিক্ষা আছে আখ্যানে। তাই গল্প নেতিতে নয়, শেষ হয় ইতির পাঠ দিয়ে।

চতুর্থত, ঐতিহ্য পরম্পরা : সৃজন ও দুর্জনের স্বরূপ...

রাণী (আসলে দাসী)	দাসী (আসলে রাণী)
● ‘যে পিটা করিলেন, —আস্কে পিটা, চাস্কে পিটা আর ঘাস্কে পিটা!’	‘চন্দ্রপুলী, মোহনবাঁশী, ক্ষীরমুরলী, চন্দনপাতা এই সব পিটা করিয়াছেন।’
● ‘একমন চাল বাড়িয়া সাত কলস জলে গুলিয়া এ-ই এক গোছা শনের নুড়ি ডুবাইয়া, সারা আঙ্গিনা লেপিতে বসিলেন। এখানে এক খাবল দেন, ওখানে এক খাবল দেন।’	‘আঙ্গিনার এক কোণে একটু বাড়-বাড় দিয়া পরিষ্কার করিয়া একটুকু চালের গুঁড়ায় খানিকটা জল মিশাইয়া, এতটুকু নেকড়া ভিজাইয়া, আস্তে আস্তে, পদ্ম-লতা আঁকিলেন, পদ্ম-লতার পাশে সোনার সাত কলস আঁকিলেন; কলসের উপর চূড়া, দুই দিক ধানের ছড়া আঁকিয়া, ময়ূর, পুতুল, মা লক্ষ্মীর সোনা পায়ের দাগ, এই সব আঁকিয়া দিলেন।’

সৃজন ব্যক্তি কখনো তার শিকড়ের কথা, ঐতিহ্য-পরম্পরা ভোলে না। বহন করে নিয়ে চলে স্বভাবে। অন্যদিকে দুর্জন ব্যক্তি ছলনার আশ্রয় নিলেও তার প্রতারণা আড়াল করা যায় না, স্বভাব-চরিত্রে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

পঞ্চমত, পরিবেশ পাঠ...

প্রাণী	গাছপালা	ফুল	ফল	খাদ্য	জড়	সময়	সম্পর্ক	স্থান	বিশেষণ	পেশা
গরু	নটে গাছ	চাঁপা	আম	সন্দেশ	ধূলা	দুপুর	ছেলে	সাগর	দসি	রাখাল
ব্যাঙ	কলাগাছ	পারুল	তাল	পাস্তা	চাঁদ	রাত	মা	আকাশ	সোনা	কামার
সাপ	ধান	পদ্ম	শশা	ঘি	পাগড়ী	সন্ধ্যা	বাবা	পাতাল	যাদু	কাঠুরিয়া
ভীমরঙ্গ	ভেরেভা		ডালিম	দুধ	জোছনা	ভাদর	মাসি	খাল	কানা	চোর
বিড়াল	কচু		কলা	ভাত	কাঠ	বৎসর	খোকা	রাজ্য	ভান্ডা	সিপাই
ঘোড়া	শ্যামুড়া			পায়েস	সিংহাসন	ভোর	শ্বশুর	ঘর	ক্ষুদে	পাটনী
উই	বেগুন			পিঠা	কুড়ুল		শাশুড়ী	দোর	বুড়ো	হাটুরে
রুই	ঘাসবন			তালের বড়া	ধন		জামাই	অলিগলি	আঁটকুড়ে	ঠাকুর (পুরোহিত)
কাংলা										

শিশুর মনস্তত্ত্ব গঠনে তার পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। রূপকথাগুলিও গড়ে উঠেছে বঙ্গদেশের প্রকৃতি, জীবনযাপন, খাদ্যাভ্যাস, পারিবারিক সম্পর্ক, পেশা সহ নানাবিধ শব্দের পটভূমিতে। ফলে বিভিন্ন শব্দের সঙ্গে পরিচয় ঘটার সুযোগ থাকায় পারিপার্শ্বিকতার মেলবন্ধনে শিশু বেড়ে ওঠার পরিসর পায়। গল্পের ছলেই সে আয়ত্ত করে ফেলে তার চৌহদ্দিকে।

যষ্ঠত, ‘বিশেষ’ শব্দ-সম্ভোগ

রূপকথার জগতে চরিত্রদের বিকাশ ঘটানোয় সাহায্য নেওয়া হয় এমন সব ধ্বন্যাত্মক শব্দের যারা অনুপস্থিত থাকলে ঐ বিশেষ বৈশিষ্ট্যটিই থেকে যেত অধরা। শব্দগুলির মোহময়তা এমনই যে বারবার গল্প-শ্রবণে স্মৃতিতে পাকাপাকি আসন পেতে নেয় তারা,

- ‘রাজার শরীর থরথর কাঁপে’
- ‘রাণী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল’
- ‘অজিত খড়মড় করিয়া উঠিয়া দেখে’
- ‘ঘর ছমছম করিতেছে’
- ‘রাণীর হাতে বালা-কাঁকণ বামবাম করিতেছে’
- ‘আপনার ছেলেকে মুড়মুড় করিয়া চিবাইয়া খাইল’
- ‘রাণীর মন ছনছন, বুক কনকন’
- ‘জোড়া রাজপুত্র শনশন করিয়া রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গেল’
- ‘সূতাশঙ্খ বিষদাঁতে আগুন ছুটাইয়া লকলক করিয়া উঠিয়াছে’
- ‘কলকল শব্দে রক্ত নদীর জল তোড়ে ছুটিয়াছে’
- ‘ধ্বড়-ধ্বড় শব্দে হাজার সিঁড়ির ধাপ ধবসিয়া গেল’
- ‘রাজপুরীতে ভূমিকম্প — গুড়গুড় দুড়-দুড় শব্দ!’
- ‘বিড়াল গড়গড় করিয়া ইদুরকে ধরিয়া ছিঁড়িয়া খাইয়া ফেলিল’
- ‘ছটফট রটারট শব্দ’
- ‘ঘরে প্রদীপ দপদপ, রাজপুত্রের মন ছব্ ছব্’
- ‘চড়চড় করিয়া দেওয়ালের গা ফাটিয়া গেল’
- ‘চুর্ চুর্ ঝুর্ ঝুর্ চারিদিকে ঝালর-পাত খসিয়া পড়িতে লাগিল’

যদিও ব্যাকরণগত দিক থেকে এরা ধ্বন্যাত্মক শব্দ তবে সেই কাঠিন্যের দিকে না গিয়েও শিশু-শ্রোতারা এটুকু বোধগম্য করবে যে এইসব বিশেষ শব্দ তাদের মনে এক বিশেষ অনুরণন সৃষ্টি করে। সেখান থেকেই শব্দগুলির প্রতি তাদের আগ্রহ তৈরি হবে।

সপ্তমত, ‘এক’-এর ব্যবহার...

কেবলমাত্র ‘এক’ শব্দটি যে কতভাবে আখ্যানে হাজির থাকতে পারে, তার প্রয়োগ-পরিধি যে কী বিশাল সে-খবর পাওয়াই যেত না রূপকথার আঙিনায় পা না রাখলে,

- এক রাজা
- রাজার এক রাণী

- এক রাজপুত্র
- রাণীর আয়ু একজোড়া পাশার মধ্যে
- তালগাছে এক রাক্ষসী
- একদিন রাজা মুগয়ায় গিয়াছেন
- রাক্ষসী এক ভিখারিণী সাজিয়া রাজপুত্রের কাছে গেল
- মায়ের জিভের একফোঁটা জল টসকরিয়া পড়িল!
- এক পক্ষিরাজে চড়িয়া বড়কুমার গেলেন
- রাক্ষসী ঘরে গিয়া এক কৌটা খুলিল
- ‘রাক্ষসী এক ডালিম হাতে মন্ত্র পড়িল’
- ‘একখানে রাত্রি হইল’ ‘একখানে গিয়া ভোর হইল’
- এক গাছের ফলের মধ্যে সুতা ঘুমাইয়া রহিল’
- ‘এক ভাই বলিলেন’
- ‘পক্ষিরাজ এক পাহাড়ের উপর পড়িয়া পাথর হইয়া রহিল’
- ‘সে এক নগর’
- ‘পাট হাতী একজনকে ধরিয়া সিংহাসনে তুলিয়া নেয়’
- ‘এক ইঁদুর পাশা উল্টাইয়া দেয়’
- ‘এক গ্রামের মধ্যে গিয়া রাজপুত্র এক বিড়ালের ছানা নিয়া আসিলেন’
- ‘একরাশ তুলা, এক চরকা নিয়া, পবনের নায়ে উঠিল’
- ‘এক একরত্তি বুড়ী!’

উল্লেখ্য, যেখানে ‘একজন’, ‘একটা’ বা ‘একটি’ প্রত্যাশিত সেখানে অবলীলায় কেবল ‘এক’ ব্যবহৃত। কথ্যরীতির টানেই এমন চেহারা। শিশুবয়সের মধ্য বা অন্ত্যভাগে থাকা শ্রোতা বা পাঠকেরা এখান থেকে একটি শব্দের নানাভাবে প্রয়োগের কৌশল রপ্ত করে নিজস্ব ভাষাজ্ঞান সমৃদ্ধ করতে পারবে। হয়তো ভবিষ্যৎ শিল্পীর বুনিনাদ গড়ে দেবে এই শিক্ষা।

অষ্টমত, সংখ্যা-পরিচিতি...

মনোযোগ সহকারে শ্রবণে পরিবেশ-জ্ঞানের পাশাপাশি রূপকথা শিশুর প্রাথমিক ‘প্রাইমার’-এর অপর দায়িত্বও অনেকটাই সামলে দিতে পারে ‘সংখ্যা-পরিচিতি’-র মাধ্যমে। ‘শূন্য’ থেকে শুরু করে এক, দুই, তিন, কোটিতে থামেনি সেইসঙ্গে ভগ্ন-সংখ্যাও আনা হয়েছে আখ্যান-বিন্যাসে,

- ‘শূন্য পুরীতে আবার সোনার হাট মিলিল’
- ‘এক পৌনে আঙ্গুল কুড়াল’
- ‘আখানা চোর ছোট চোরের পায়ে পড়িল’
- ‘সে এক নগর!’
- ‘শুনিয়া দেড় আঙুলে বড় খুশী হইল’
- ‘যত রাক্ষসের দুই পা খসিয়া পড়িল’

- ‘আড়াই আঙ্গুলে খুব রাগিয়া গিয়াছে’
- ‘তিন ফুঁয়ে রান্ধসী, রাণীর আয়ু পাশা, কোন্ রাজ্যে পাঠাইল কে জানে?’
- ‘রাজপুরীর চারদিকে ঢাক-ঢোল, সানাই-নাকাড়া বাজিয়া উঠিল!’
- ‘চৌদোলা পঞ্চকটক নিয়া সরোবরের পাড়ে আসিয়া মস্ত্রিপুত্র ডাকেন’
- ‘রাজপুত্র সখা সাথী পাঁচজন লইয়া পাশা খেলিতেছিলেন’
- ‘আপনার ছয় বোন নিয়া তাঁহাকে বরণ করিবে’
- ‘সাত পাশাবতী সাত কেঁচো হইয়া মরিয়া রহিয়াছে!’
- ‘সাড়ে সাত চোর সেইখান দিয়া চুরি করিতে যায়’
- ‘আট রাজপুত্র আট পক্ষিরাজের সারি দিয়া রাজ্যে ফিরিয়াছেন’
- ‘দশ মাস দশ দিন যায়’
- ‘বার বছর তের দিনে ‘দুধ-মুকুটে’ ধবল পাহাড়ের কাছে গিয়া পৌঁছিলেন’
- ‘এক বিঘত ধানের চৌদ্দ বিঘত চাল’
- ‘জন্মিতে জন্মিতে বুড়ীর চুল দাড়ি আঠারো কুড়ি’
- ‘এককুড়ি এক বড়া সাজিয়ে দিতিস নেমস্তন’ (=২১টি)
- ‘সূতাশঙ্খ বত্রিশ ফণা ছড়াইয়া লকলক করিয়া উঠিয়াছে’
- ‘তের রাত্রি তেত্রিশ দিনে কিরণমালা পাহাড়ে গিয়া উঠিলেন’
- ‘বার মাস ছত্রিশ দিনে সেই অটালিকা তৈয়ার হইল’
- ‘রান্ধসী সতীন পুতকে তিন ছত্রিশ গালি দেয়’ (৩×৩৬)
- ‘কত শত খড়ি পাতে, কত শত মাটি কাটে’
- ‘ডালিম গাছে হাজার ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে’
- ‘হাজারো ফণা সাত কুচি সাপ’
- ‘রাজপুরীতে সন্ধ্যার পর লক্ষ কাড়া লক্ষ সানাই’
- ‘কোটি-কোটিশ্বর হইয়া যুগ যুগ রাজত্ব করিতে লাগিলেন’
- ‘কোটি রঙের কোটি সাপ ডিঙ্গাইয়া, সাপের উপর দিয়া হাঁটিয়া দুই জনে এক ঘরে গেলেন’

লক্ষণীয়, গণনা-পদ্ধতিতে তৎকালীন প্রচলিত শব্দ-ব্যবহারের ঝোঁক থাকায় কিছু সংখ্যা আজকের শ্রোতার কাছে অপরিচিত মনে হবে।

নবমত, বিস্ময়ের দুনিয়ার সঙ্গে পরিচিতি...

শিশুমনের অসীম কৌতূহল, কল্পনার বিস্তার জিইয়ে রাখার উপযুক্ত উপাদান বিস্ময়ের জোগান দেওয়া। চরিত্র-কল্পনা, ঘটনা-বুনন, পরিবেশ-পরিকল্পনা, সংলাপের অভিনবত্ব — এই সবকিছুই সম্ভব যথাযথ বিস্ময়-বিন্যাসে। উপযুক্ত শব্দ-সংযোজন একাজে প্রধান সহায়ক।

- ‘রাজপুরীতে আসিয়া ভুতুম আর বুদ্ধ অবাক! মস্ত-মস্ত দালান; হাতী, ঘোড়া, সিপাই, লক্ষর কত কি!’
- ‘আমাদের দুই রাণী ছিলেন, তাঁহাদের পেটে পেঁচা আর বানর হইয়াছিল।’

- ‘সোনার খাটে গা, রূপার খাটে পা রাখিয়া রাজপুরীর মধ্যে, পাঁচ রাণীতে বসিয়া সিঁথিপাটি করিতেছিলেন।’
- শুকপঙ্খী নৌকার ‘রূপার বৈঠা, হীরার হাল। নায়ের মধ্যে মেঘ-বরণ চুল কুচ-বরণ কন্যা বসিয়া সোনার শুকের সঙ্গে কথা কহিতেছে।’
- ‘মাঝি-মাল্লা, সিপাই-লস্কর সব শুদ্ধ পাঁচ রাজপুত্রকে থলের মধ্যে পুরিয়া তাহাদিগে দিয়া তিন বুড়ী তিন সন্ধ্যা জল খাইয়া, নাক ডাকাইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।’
- ‘রাজপুত্রেরা বুদ্ধ-ভূতুমের লেজ আর পুচ্ছ ধরে ‘বুড়ীদের নাকের ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া আসিল।’
- ‘ঢোল-ডগরের ডাহিনে ঘা দিলে হাট-বাজার বসে, বাঁয়ে ঘা দিলে হাট-বাজার ভাঙ্গিয়া যায়।’
- ‘রাজকন্যা বলিলেন, “আমি এই কোটার মধ্যে থাকি”।’
- ‘গাছের পাতায়-পাতায় কত রকম ফল ধরিয়া রহিয়াছে।’
- ‘দেখিতে দেখিতে, সোনার কাটিটি কখন টুক করিয়া ঘুমন্ত রাজকন্যার মাথায় ছুঁইয়া গেল! অমনি পদ্মের বন ‘শিউরে’ উঠিল, সোনার খাট নড়িয়া উঠিল, সোনার পাঁপড়ি ঝরিয়া পড়িল, রাজকন্যার হাত হইল, পা হইল; গায়ের আলস ভাঙ্গিয়া, চোখের পাতা কচলাইয়া ঘুমন্ত রাজকন্যা চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন।’
- ‘আর অমনি রাজপুরীর চারিদিকে পাখী ডাকিয়া উঠিল, ...হাজার বছরের ঘুম হইতে, যে যেখানে ছিলেন, জাগিয়া উঠিলেন...’
- ‘রাজপুত্র অবাক হইয়া গেলেন,

রাজকন্যা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন।’

যেসব ঘটনা বাস্তব জীবনে অসম্ভব সেসব রূপকথায় দিব্যি সম্ভব। শ্রোতার মনে বিস্ময় জাগে কিন্তু অবিশ্বাস উঁকি মারে না। যে-মায়াময় আবেশ তৈরি করা হয় সেখানে একবার প্রবেশ করলে সবই প্রশ্নাতীত হয়ে যায়। শুধু বিস্ময়টুকু বেঁচে থাকে বলেই শ্রোতাদের কাছে রূপকথার জগৎ কখনো পুরনো হয় না। ‘বিস্ময়’ সেই গুণ যা রোজকার জিনিসও নিত্য নতুন করে তোলে। রূপকথাগুলির সার্থকতা এই গুণেই। এখান থেকেই শিশুর কল্পনা-প্রবণতা রসদ জোগাড় করে, তার বৌদ্ধিক বিকাশের দুয়ার উন্মুক্ত করার জন্য যা অপরিহার্য।

৩

রূপকথার কল্পলোকে বৃন্দ হয়ে গেলে আর বিচার্য থাকে না চরিত্র, ঘটনা বা জগৎ কতটা বাস্তবসম্মত! শ্রোতারা তখন ব্যস্ত মনোলোকে সেই রঙিন জগৎ রচনায় যেখানে বসত করে বাস্তবে না-পাওয়া, অধরা, অজানারা। বারবার শ্রবণেও সাধ মেটে না, এমনই তার জাদু। বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই হাজির আর একরাশ বিস্ময়। শিশু তার স্মৃতির ভাণ্ডারে জোগাড় করে অমূল্য সব সম্পদ,

- ✓ নির্মল আনন্দ
- ✓ ‘ইতিবাচক মানুষ’ হওয়ার পাঠ
- ✓ মূল্যবোধের সহায়
- ✓ কল্পনার জাল বুনের মন
- ✓ স্বপ্ন দেখতে শেখা
- ✓ পরিবেশ-পরিচিতি

✓ ভাষা শিক্ষা ও সঞ্চয়

✓ বড়োবেলায় ‘ছোটোবেলা’ বাঁচিয়ে রাখার মন্ত্র

মানবজীবনের প্রথম পর্বে কোমলমতি শিশু যে-মনোজগৎ নিয়ে অপার বিস্ময়ে এই দুনিয়াকে চোখ মেলে অবলোকন করে সেখানে থাকে কেবলই পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। জানার আকাঙ্ক্ষা। সেই মনের উপযোগী রসদ হতে পারে লোকজ রূপকথার রঙিন জগৎ। কেবল মনোরঞ্জন নয়, ভবিষ্যৎ জীবন গঠনেও এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ব্যবহৃত প্রতি শব্দের যথাযথ মর্ম উদ্ধারে কেবল ভাষার সঙ্গে ভালোবাসা নয় একইসঙ্গে সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গেও ঘটবে আত্মিক যোগ। দৃঢ় হবে পরিবেশ পরিজনের সঙ্গে ইতিবাচক সখ্য। এইপথেই রক্ষিত হবে প্রাচীন ঐতিহ্যের পরম্পরা। দুরূহ পণ্ডিত শব্দের আনাগোনা না থাকায় মনোযোগ আকর্ষণে বাধা সৃষ্টি না হওয়াই দস্তুর। বাংলা ভাষার লোক-ঐতিহ্য, বঙ্গ-সংস্কৃতির পরম্পরা বাঁচিয়ে রাখার এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সঙ্গে তার সংযোগ ঘটানোর অবলম্বন হয়ে ওঠায় বাধা নেই বাংলা রূপকথার। প্রয়োজন শিশুর গোচরে আনা ও শ্রবণে আগ্রহী মন তৈরি করা।

* আলোচনায় স্থূলান্ধুর বর্তমান আলোচককৃত।

উল্লেখসূত্র

^১ ঠাকুরমার ঝুলি, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। ‘ভূমিকা’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩১৪।

গ্রন্থপঞ্জি

- ^১ গঙ্গোপাধ্যায়, আশা। ১৩৬৬। বাংলা শিশু-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৮০০-১৯০০)। কলিকাতা : ডি এম লাইব্রেরী।
- ^২ মিত্র, খগেন্দ্রনাথ। ১৯৫৮। শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য (১৮১৮-১৯১৮)। কলিকাতা : বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড।
- ^৩ মিত্র, মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন। ১৩১৪। ঠাকুরমার ঝুলি। কলিকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স।
- ^৪ Bronson, Po and Ashley Merryman. 2011. *Nurture Shock : New Thinking about Children*. USA : Twelve.
- ^৫ Healy, Jane M. 2004. *Your Child's Growing Mind : Brain Development and Learning from Birth to Adolescence*. USA : Harmony.
- ^৬ Lantieri, Linda and Daniel Goleman. 2014. *Building Emotional Intelligence : Practices to Cultivate Inner Resilience in Children*. New York : Sounds True.

লেখক পরিচিতি

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা।
ইমেল : devaratijana@gmail.com